Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XIV, Issue-IV, July 2026, Page No. 19-28
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi, Assam, India
Website: http://www.thecho.in
DOI: 10.64031/pratidhwanitheecho.vol.14.issue.04W.113

ভারতের গণপরিষদের বিতর্ক: সাংবিধানিক আদর্শ ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগঠনের ভিত্তি

সুবীর গায়েন, *সহকারী অধ্যাপক, ধ্রুবচাঁদ হালদার কলেজ, দক্ষিণ বারাশত, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 15.07.2026; Accepted: 22.07.2026; Available online: 31.07.2026
©2026 The Author(s). Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The Constituent Assembly Debates of India are one of the most important intellectual and democratic exercises in the constitutional history of the country. They provide a full account of the conversations, arguments and arrangements that led to the formation of the Constitution of India during 1946-49. The paper deals with the Constituent Assembly Debates as the foundation of the constitutional ideals and democratic state-building of India. It looks into the major issues like fundamental rights, federalism, secularism, social justice, protection of minorities, parliamentary democracy and Directive Principles of State Policy and how the framers dealt with them. The study, through an analysis of the debates, points to the philosophical vision, political compromises and institutional choices that continue to influence India's constitutional governance. The paper also examines the present-day relevance of these debates, both for the interpretation of constitutional provisions and in the light of new legal and political challenges.

Keywords: Constituent Assembly Debates, Indian Constitution, Constitutionalism, Democratic State-Building, Constitutional Ideals

ভারতের সংবিধান প্রণয়নের গতিপ্রকৃতি অনুধাবনের ক্ষেত্রে গণপরিষদের বিতর্কসমূহ এক অনন্য দলিল হিসাবে বিবেচিত। ১৯৪৬ সালের ৬ ডিসেম্বর সংবিধান রচনার লক্ষ্যে গণপরিষদ গঠিত হয়। উল্লেখ্য, ১৯৪৬ সালের ৯ ডিসেম্বর থেকে ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর পর্যন্ত সংবিধান রচনার উদ্দেশ্যে গণপরিষদে মোট ১১ টি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই সময়কালে সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে গণপরিষদে যে মতবিনিময়, আলোচনা ও বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তাকে সামগ্রিকভাবে 'গণপরিষদের বিতর্ক' বলা হয়। সংবিধান প্রণয়নে গণপরিষদে বিতর্কের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিতর্কের বিষয়বস্তুর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল প্রস্তাবনা, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, নাগরিকত্ব, মৌলিক অধিকার, অস্পৃশ্যতা, ধর্মীয় অধিকার, সংখ্যালঘুদের অধিকার, রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিসমূহ, রাষ্ট্রপতি, নির্বাচন কমিশন, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনব্যবস্থা ইত্যাদি।

প্রস্তাবনা প্রসঙ্গে গণপরিষদের বিতর্ক:

ভারতের সংবিধান প্রণয়নের প্রক্রিয়ায় গণপরিষদের আলোচনাগুলির মধ্যে প্রস্তাবনা নিয়ে বিতর্ক ছিল বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। প্রস্তাবনা হল সংবিধানের মুখবন্ধ বা ভূমিকার মতো, যার মাধ্যমে রাষ্ট্রের প্রকৃতি, মৌলিক মূল্যবোধ এমনকি সংবিধানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। উল্লেখ্য, গণপরিষদে প্রস্তাবনা প্রসঙ্গে আলোচনা শুরু হয় ১৯৪৯ সালের ১৭ অক্টোবর।

গণপরিষদের অন্যতম সদস্য কে. টি. শাহ প্রস্তাবনায় 'ধর্মনিরপেক্ষ' (Secular), 'যুক্তরাষ্ট্রীয়' (Federal) এবং 'সমাজতান্ত্রিক' (Socialist) শব্দগুলি যোগ করার প্রস্তাব করেন। আম্বেদকর শাহের এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। তিনি বলেন, রাষ্ট্র কী ধরনের নীতি গ্রহণ করবে, সমাজকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে কীভাবে গড়া হবে, তা জনগণ নিজেরাই সময় ও পরিস্থিতি অনুযায়ী ঠিক করবে। আম্বেদকর আরও বলেন যে, সংবিধানে নির্দেশমূলক নীতিতে যে সমস্ত নির্দেশমূলক নীতির কথা বলা হয়েছে তা কার্যত 'সমাজতান্ত্রিক' ভাবনার নিদর্শন। তাই আলাদা করে প্রস্তাবনাতে 'সমাজতান্ত্রিক' শব্দটি যুক্ত করার কোনো প্রয়োজন নেই। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯৭৬ সালের ৪২ তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে 'সমাজতন্ত্র' শব্দটি যুক্ত করা হয়েছে।

আম্বেদকর প্রস্তাবনায় "আমরা ভারতের জনগণ, ভারতকে একটি সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র হিসাবে গড়ে তুলতে সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে শপথ গ্রহণ করছি" ("We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a Sovereign Democratic Republic")— এই বাক্যটি অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করেন। বিশিষ্ট উর্দু কবি এবং 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' স্লোগানের প্রবর্তক তথা জাতীয় কংগ্রেসের নেতা মৌলানা হাসরাত মোহানি (Maulana Hasrat Mohani) আম্বেদকরের এই প্রস্তাবের তীব্র বিরোধীতা করেন। তিনি বলেন 'উদ্দেশ্যসমূহ সংক্রান্ত প্রস্তাব' (Objectives Resolution)-এ 'স্বাধীন সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র' (Independent Sovereign Republic)- এই তিনটি শব্দ ছিল। কিন্তু খসড়া কমিটি 'সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র' (Sovereign Democratic Republic) শব্দবন্ধটি গ্রহণ করেছিল, কারণ 'সার্বভৌম' (Sovereign) শব্দটির মধ্যেই স্বাধীনতার ধারণা নিহিত থাকে। তিনি গণপরিষদকে অনুরোধ করেন প্রস্তাবনার জন্য নিম্নলিখিত তিনটি বিকল্পের মধ্যে কোনটি গ্রহণ করা হবে তা ঠিক করতে— (১) 'সার্বভৌম স্বাধীন প্রজাতন্ত্র' (Sovereign Independent Republic), (২) 'সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র' (Sovereign Democratic Republic) এবং (৩) 'সার্বভৌম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র' (Sovereign Democratic State)। তবে শেষ পর্যন্ত আলোচনা-পর্যালোচনার পর 'সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র' (Sovereign Democratic Republic) শব্দবন্ধটিই গৃহীত হয়।

প্রস্তাবনায় 'ঈশ্বর' (God) এবং 'গান্ধী' (Gandhi) শব্দদুটি যুক্ত করার বিষয়ে গণপরিষদে তীব্র বিতর্ক দেখা দেয়। এইচ. ভি. কামাথ প্রস্তাব করেছিলেন, প্রস্তাবনার শুরুতে 'আমরা ভারতের জনগণ'-এর আগে 'ঈশ্বরের নামে' (In the name of God) শব্দ যোগ করা হোক। সাক্সেনা (Shibban Lal Saxena) এ বিষয়ে মতামত দেন যে, আয়ারল্যান্ডের সংবিধানও ঈশ্বরকে স্মরণ করে এবং তাদের শহীদদের সম্মান জানিয়ে শুরু হয়েছিল। ব্রজেশ্বর প্রসাদ (Brajeshwar Prasad), জে. বি. কৃপলানি (J.B Kripalani) প্রমুখগণ এই বক্তব্যের বিরোধিতা করেন। জে. বি. কৃপলানি বলেন, গান্ধীর নাম সংবিধানে রাখা উচিত নয়, কারণ সংবিধান যে কোনো সময় পরিবর্তন হতে পারে। শেষ পর্যন্ত সাক্সেনা তাঁর সংশোধনী প্রত্যাহার করে নেন। এ. টি. পিল্লাই (A.T. Pillai) 'ঈশ্বর' শব্দটির সংযোজন প্রসঙ্গে বলেন, এই শব্দ বাধ্যতামূলকভাবে সংবিধানে ঢুকলে ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার লঙ্ঘিত হবে। উল্লেখ্য প্রস্তাবটি শেষ পর্যন্ত ৬৮/৪১ ভোটে বাতিল হয়ে যায়।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রসঙ্গে গণপরিষদের বিতর্ক:

ভারতের সংবিধান প্রণয়নের সময় গণপরিষদের অন্যতম আলোচিত ও বিতর্কিত বিষয় ছিল যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা। দেশভাগ-পরবর্তী রাজনৈতিক অস্থিরতা, শাসনব্যবস্থার স্থায়িত্ব ও জাতীয় ঐক্যের স্বার্থে ভারতে শক্তিশালী কেন্দ্র গঠন অপরিহার্য হলেও, ভারতের বহুত্ববাদী ও বৈচিত্র্যময় প্রকৃতির কারণে যুক্তরাষ্ট্রীয়

কাঠামোর প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করার কোনো সুযোগ ছিল না। যদিও, সংবিধানের কোথাও 'যুক্তরাষ্ট্র' (Federation) শব্দটির উল্লেখ করা হয়নি। সংবিধানের ১ (১) নং ধারায় 'ইউনিয়ন' (Union) শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে এবং আম্বেদকরই 'যুক্তরাষ্ট্র' শব্দটির পরিবর্তে 'ইউনিয়ন' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন।

এই প্রসঙ্গে আম্বেদকর গণপরিষদে বলেন যে, দক্ষিণ আফ্রিকার এককেন্দ্রিক সরকারকেও একটি 'ইউনিয়ন' বলা হয়, সেকারণে ভারতকে একটি 'ইউনিয়ন' হিসাবে বর্ণনা করা প্রচলিত রীতির পরিপন্থী নয়। তিনি আরও বলেন যে, ভারত একটি যুক্তরাষ্ট্র হলেও, এই যুক্তরাষ্ট্র অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে কোনো চুক্তির মাধ্যমে গড়ে ওঠেনি, অঙ্গরাজ্যগুলি স্বেচ্ছায় যুক্তরাষ্ট্র গঠন করেছে। সেকারণে কোনো অঙ্গরাজ্যের এখান থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কোনো অধিকার নেই। যুক্তরাষ্ট্রকে 'ইউনিয়ন' বলা হয়েছে, কারণ এটি অবিচ্ছেদ্য (indissoluble)।

গণপরিষদের অন্যতম সদস্য কে. টি. শাহ (K. T. Shah) সংবিধানের ১ নং ধারায় 'ধর্মনিরপেক্ষ' (Secular), 'যুক্তরাষ্ট্রীয়' (Federal) এবং 'সমাজতান্ত্রিক' (Socialist) শব্দগুলি অন্তর্ভুক্ত করার জন্য দু'বার সংশোধনী প্রস্তাব আনেন। কিন্তু খসড়া কমিটির বৈঠকে আম্বেদকর এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। কামাথ (H. V. Kamath) শাহের প্রস্তাবটিকে বিরোধিতা করেন এবং তিনি 'যুক্তরাষ্ট্রীয়' শব্দটির পরিবর্তে 'ইউনিয়ন' শব্দটি থাকার বিষয়ে যুক্তি দেখিয়েছিলেন। তিনি বলেন যে, সুপ্রাচীনকাল থেকেই ভারতে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বিচ্ছিন্নতার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়, সেকারণে 'যুক্তরাষ্ট্রীয়' শব্দটি না রেখে 'ইউনিয়ন' শব্দটি রাখাই শ্রেয়। উল্লেখ্য, শেষ পর্যন্ত শাহের প্রস্তাব খারিজ হয়ে যায় এবং 'ইউনিয়ন' শব্দটি রাখা হয়।

নাগরিকতা প্রসঙ্গে গণপরিষদের বিতর্ক:

স্বাধীনতার প্রাক্কালে দেশভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা এবং বহুসাংস্কৃতিক সমাজের প্রেক্ষাপটে ভারতে নাগরিকত্বের ভিত্তি নির্ধারণ করা ছিল একটি কঠিন কাজ। কে নাগরিক হিসাবে বিবেচিত হবেন, কীভাবে নাগরিকত্ব অর্জন বা বিলোপ হবে, দ্বৈত নাগরিকত্ব থাকবে কি না— এই সমস্ত প্রশ্ন নিয়ে গণপরিষদের সদস্যদের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনা ও বিতর্ক হয়। উল্লেখ্য, গণপরিষদে নাগরিকতা সম্পর্কিত আলোচনা ও বিতর্কটি অনুষ্ঠিত হয় ১৯৪৯ সালের ১০ ও ১১ আগস্ট।

খসড়া সংবিধানে নাগরিকতা সম্পর্কে উদার ও ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছিল। খসড়া সংবিধানে নাগরিকতা অর্জনের ক্ষেত্রে ধর্মভিত্তিক কোনো পরিচয়কে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়নি। তবে, নাগরিকতা প্রসঙ্গে এই দৃষ্টিভঙ্গিকে কেন্দ্র করে গণপরিষদের সদস্যদের মধ্যে মতপার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। গণপরিষদের অন্যতম সদস্য ড. পি. এস. দেশমুখ (Dr. P. S. Deshmukh) ৫ নং ধারার পরিবর্তনের প্রস্তাব দেন। তিনি সার্বজনীনভাবে স্বীকৃত 'জন্মের ভিত্তিতে নাগরিকত্ব' (jus soli) নীতিকে বাদ দিয়ে তার পরিবর্তে ধর্মীয় শর্ত যোগ করতে চেয়েছিলেন। তিনি বলেন যে, হিন্দু বা শিখ ধর্মাবলম্বী মানুষ এবং যিনি কোনো রাষ্ট্রের নাগরিক নন, তিনি যেখানেই বাস করুন না কেন, ভারতের নাগরিক হওয়ার অধিকারী হবেন।

আর. কে. সিদ্ধভা (R. K. Sidhva), জওহরলাল নেহরু, ব্রজেশ্বর প্রসাদ, মেহবুব আলি বেগ (Mahboob Ali Baig), আল্লাদী কৃষ্ণস্বামী আয়ার প্রমুখগণ দেশমুখের প্রস্তাবের তীব্র বিরোধীতা করেন। আর. কে. সিদ্ধভা বলেন, কিছু নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের নাম উল্লেখ করলে অন্য সম্প্রদায়গুলির মনে হবে যে তাদের উপেক্ষা করা হচ্ছে। জওহরলাল নেহরু দৃঢ়ভাবে নাগরিকত্বের সংজ্ঞাকে সর্বজনীন (ধর্মনিরপেক্ষ) ভিত্তিতে রাখার পক্ষে মত দেন। আল্লাদী কৃষ্ণস্বামী আয়ার বলেন, "আমরা কোনো জাতিগত, ধর্মীয় বা অন্য

কোনো ভিত্তিতে মানুষকে আলাদা করতে পারি না”। মেহবুব আলি বেগ দেশমুখের প্রস্তাবকে ‘হাস্যকর’ বলে সমালোচনা করেন। অবশেষে দেশমুখের করা প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়। দীর্ঘ বিতর্কের পর সংবিধানে দ্বিতীয় অংশে (Part-II) ৫ থেকে ১১ নং ধারায় নাগরিকতার বিষয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

মৌলিক অধিকার প্রসঙ্গে গণপরিষদের বিতর্ক:

ভারতের সংবিধান প্রণয়নের সময় মৌলিক অধিকারের প্রসঙ্গটি ছিল গণপরিষদের বিতর্কের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির মধ্যে একটি। আম্বেদকর মৌলিক অধিকারের অংশটিকে সবথেকে সমালোচিত অংশ বলে উল্লেখ করেছেন। উল্লেখ্য, সংবিধানের তৃতীয় অংশে অন্তর্ভুক্ত মৌলিক অধিকারগুলি নিয়ে গণপরিষদে প্রায় ১৬ দিন ধরে বিতর্ক হয়েছিল। ভারতের মৌলিক অধিকারগুলি মূলত সামাজিক, রাজনৈতিক ও আইনগত প্রকৃতির। কারণ জনগণের অর্থনৈতিক অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়নি। গণপরিষদের অনেক সদস্য অর্থনৈতিক অধিকারকে মৌলিক অধিকারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানান।

জাতিধর্মবর্ণ, লিঙ্গ বা জন্মস্থানের ভিত্তিতে অসাম্য রোধের বিষয়ে গণপরিষদের সদস্যদের মধ্যে মৌলিক কোনো মতপার্থক্য ছিল না। তবে, মৌলিক অধিকারের কিছু ক্ষেত্রে, বিশেষত সংবিধানের ১৯-২২ নং ধারায় উল্লেখিত স্বাধীনতার অধিকারের ক্ষেত্রে ‘যুক্তিসংগত বাধানিষেধ’ (Reasonable Restrictions) আরোপ করার বিষয়ে গণপরিষদে তীব্র বিতর্ক হয়েছিল। গণপরিষদের কিছু সদস্য পূর্ণ স্বাধীনতার কথা বলেছিলেন। অন্যদিকে কিছু সদস্য যেমন হনুমন্তাইয়া (K. Hanumanthaiah), আল্লাদী কৃষ্ণস্বামী আয়ার প্রমুখগণ বলেন যে, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা, জনশৃঙ্খলা, সংহতি রক্ষার প্রয়োজনে স্বাধীনতার উপর সীমাবদ্ধতা আরোপ অপরিহার্য। তাঁদের মতে, রাষ্ট্র যদি সীমাহীন স্বাধীনতা প্রদান করে, তবে তা অরাজকতায় পরিণত হবে। হনুমন্তাইয়া বলেন যে, অত্যাচারী ও শোষনমূলক ব্রিটিশ শাসনের অবসানের পর ভারতের সাধারণ জনগণ যে ব্যাপক মৌলিক অধিকার ভোগ করবে, তা সামাজিক ক্ষেত্রে এই ব্যাপক অধিকার ভোগ অন্য ব্যক্তির তথা সামগ্রিকভাবে সমাজের ক্ষেত্রে বিরুপ বা হানিকর প্রভাব পড়তে পারে, যা সামাজিক ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা ডেকে আনতে পারে। তাই মৌলিক অধিকার ভোগের ক্ষেত্রে ‘যুক্তিসংগত নিয়ন্ত্রণ’ থাকা দরকার। শেষ পর্যন্ত ‘যুক্তিসংগত বাধানিষেধ’ নীতিটি গৃহীত হয়।

সংবিধানের ২১ নং ধারায় উল্লিখিত জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার রক্ষার প্রশ্নে গণপরিষদে ব্যাপক বিতর্ক দেখা দেয়। গণপরিষদের অন্যতম সদস্য কাজী সৈয়দ করিমউদ্দিন (Kazi Syed Karimuddin) এক্ষেত্রে ‘যথাবিহিত পদ্ধতি’ (Due Process of Law) প্রয়োগের দাবি জানান। কৃষ্ণচন্দ্র শর্মা (Krishna Chandra Sharma) করিমউদ্দিনের এই প্রস্তাবকে সমর্থন জানান। তবে, ঠাকুর দাস ভার্গব (Thakur Das Bhargava), আল্লাদী কৃষ্ণস্বামী আয়ার, ড. বি. আর. আম্বেদকর প্রমুখগণ ‘যথাবিহিত পদ্ধতি’র (Due Process of Law) তীব্র বিরোধীতা করেন। তাঁদের মতে, ‘Due Process of Law’ শব্দটি অত্যন্ত অস্পষ্ট এবং যা কার্যত বিচার বিভাগের কর্তৃত্বকে প্রতিষ্ঠা করবে। এঁরা ‘যথাবিহিত পদ্ধতি’র (Due Process of Law) পরিবর্তে ‘আইন নির্দিষ্ট পদ্ধতি’র (Procedure established by law) ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। যার অর্থ হল-যথাযথ পদ্ধতি অনুসারে প্রণীত আইনের সমর্থন লাভ করলেই কেবল শাসন বিভাগ নাগরিকদের জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে পারে। শেষ পর্যন্ত ২১ নং ধারায় উল্লিখিত জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে ‘আইন নির্দিষ্ট পদ্ধতি’টি (Procedure established by law) গৃহীত হয়।

ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার প্রসঙ্গে গণপরিষদের বিতর্ক:

ভারতের বহুধর্মীয় সামাজিক কাঠামো, সাম্প্রদায়িক বিভাজনের প্রেক্ষিত এবং দেশভাগ-পরবর্তী জটিল রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকারকে কেন্দ্র করে গণপরিষদের সদস্যদের মধ্যে তীব্র বিতর্ক হয়েছিল। খসড়া সংবিধানের ১৯ নং ধারায় (বর্তমান সংবিধানের ২৫(১) নং ধারা) 'ধর্ম প্রচারের অধিকার'কে (right to propagate religion) অন্তর্ভুক্ত করা হবে কিনা তা নিয়ে গণপরিষদে বিতর্ক হয়েছিল। গণপরিষদের অন্যতম সদস্য লোকনাথ মিশ্র (Lokanath Misra) তিনি 'প্রচার' (Propagate) শব্দটির বিরোধীতা করেন এবং এই শব্দটিকে বাদ দেওয়ার প্রস্তাব করেন। তিনি আশঙ্কা করেন যে, এটি দুর্বল জনগোষ্ঠীর মধ্যে খ্রিস্টান মিশনারিদের জোরপূর্বক ধর্মান্তর এবং 'শান্তিপূর্ণ অনুপ্রবেশ' (peaceful penetration)-এর পথ খুলে দেবে, যার ফলে হিন্দু সংস্কৃতি বিপন্ন হতে পারে। তিনি বলেন যে, বিশ্বের কোনো সংবিধানেই ধর্মপ্রচারের অধিকারকে মৌলিক অধিকার বলা হয়নি, সেকারণে এই শব্দটিকে বাদ দেওয়া উচিৎ। কিছু সদস্য 'প্রচার' শব্দটির পরিবর্তে 'ব্যক্তিগতভাবে অনুশীলন করা'র (practise privately) মতো শব্দ ব্যবহার করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন।

লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র (Lakshmi Kanta Maitra), কে. সান্থানাম (K. Santhanam), টি. টি. কৃষ্ণমাচারি (T. T. Krishnamachari) প্রমুখগণ লোকনাথ মিশ্রের প্রস্তাবের বিরোধীতা করেন এবং 'ধর্ম প্রচারের অধিকার'টি অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষে জোরালো সওয়াল করেছিলেন। তাঁদের মতে, এই অধিকারটি কেবল ব্যক্তিগত ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রচারের জন্য প্রয়োজন। তাঁদের যুক্তি ছিল, স্বেচ্ছায় ধর্মান্তরিত হওয়া ব্যক্তির বিবেকের স্বাধীনতার (Freedom of Conscience) একটি অংশ। এটি কেবল ধর্মীয় গোষ্ঠীগত অধিকার নয়, বরং এটি প্রতিটি নাগরিকের ব্যক্তিগত অধিকার। লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র বলেন যে, ধর্মীয় প্রচারের মাধ্যমে পারস্পরিক ভুল ধারণা দূর হবে ও ধর্মীয় সহাবস্থান বৃদ্ধি পাবে।

কে. সান্থানাম বলেন, 'ধর্মপ্রচার' এর অর্থ হল মত প্রকাশের স্বাধীনতা (freedom of expression), 'ধর্মান্তর' (convert) নয়। তিনি বলেন, কেউ যদি নিজের বিবেকের স্বাধীনতায় ধর্ম পরিবর্তন করেন, তা গ্রহণযোগ্য; কিন্তু অর্থ, প্রভাব বা জোর করে গণধর্মান্তর ঘটানো হলে, সেক্ষেত্রে এই কার্যকলাপকে নিয়ন্ত্রণ করার পূর্ণ অধিকার রাষ্ট্রের রয়েছে। এই ধারার উদ্দেশ্য কেবলমাত্র ধর্মীয় স্বাধীনতা রক্ষা করা নয়, বরং সকল ধর্মের প্রতি সহনশীলতার মনোভাব প্রতিষ্ঠা করা। তবে এই সহনশীলতা সম্পূর্ণ সীমাহীন নয়—এটি জনশৃঙ্খলা, নৈতিকতা ও জনস্বাস্থ্যের শর্তের অধীনে প্রযোজ্য। কৃষ্ণমাচারী বলেন যে, ধর্মপ্রচারের অধিকার কোনো নির্দিষ্ট সম্প্রদায় বা ধর্মের জন্য নয়; এটি সকল নাগরিকের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। উল্লেখ্য, কিছু সদস্যদের তীব্র আপত্তি সত্ত্বেও, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকার এবং ধর্মীয় স্বাধীনতার গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে শেষ পর্যন্ত 'প্রচার' (Propagate) শব্দটি বহাল রাখা হয়।

সংখ্যালঘুদের অধিকার প্রসঙ্গে গণপরিষদের বিতর্ক:

ভারতের বহুধর্ম, বহুভাষা ও বহুজাতিগত বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষার বিষয়টি ছিল গণপরিষদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও সংবেদনশীল বিষয়। সংখ্যালঘুদের অধিকার প্রসঙ্গে গণপরিষদের বিতর্কের মূল লক্ষ্য ছিল দেশভাগের প্রেক্ষাপটে সংখ্যালঘুদের স্বার্থ রক্ষা করা এবং তাদের জন্য পর্যাপ্ত সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। গণপরিষদের একজন সদস্য মুসলিমদের জন্য পৃথক নির্বাচক মন্ডলীর (separate electorates) দাবি জানায়। এই প্রস্তাবকে সমর্থন করেন গণপরিষদের অন্যতম সদস্য বি. পকার বাহাদুর (B. Pocker Bahadur) । তিনি বলেন যে, দেশবিভাগের পর মুসলিম সম্প্রদায়ের চাহিদা ও মানসিকতাকে প্রাধান্য দিতে হলে পৃথক নির্বাচক মন্ডলীর ব্যবস্থা থাকা উচিৎ।

সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল সহ গণপরিষদের বেশিরভাগ সদস্যই পৃথক নির্বাচক মণ্ডলীর মাধ্যমে সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষার বিষয়টির তীব্র বিরোধীতা করেন। প্যাটেলের মতে, পৃথক প্রতিনিধিত্ব বা বিশেষ রাজনৈতিক সুবিধা জাতির ঐক্যকে বিনষ্ট করবে। প্যাটেল এবং পণ্ডিত নেহরু, যুক্তি দিয়েছিলেন যে পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা জাতীয় সংহতি ও ধর্মনিরপেক্ষতার পরিপন্থী এবং এটি সাম্প্রদায়িক বিভেদকে সুদৃঢ় করবে। গণপরিষদের অন্যতম সদস্যা বেগম আজিজা রসুল (Begum Aizaz Rasul) বলেন যে, ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণ বা পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা কার্যত কোনোদিনই সংখ্যাগুরুদের সঙ্গে সংখ্যালঘুদের একত্রিত হতে দেবে না। আম্বেদকরও পৃথক নির্বাচক মন্ডলীকে সমর্থন করেননি। তিনি সংখ্যালঘুদের সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাগত অধিকারের পক্ষে দৃঢ় সমর্থন জানান। তিনি বলেন, সংখ্যালঘুদের আত্মপরিচয় রক্ষা এবং বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য বজায় রাখতে সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা অপরিহার্য।

গণপরিষদের দীর্ঘ বিতর্ক ও আলোচনার পর শেষ পর্যন্ত পৃথক নির্বাচক মন্ডলীর প্রস্তাবটি বাতিল হয় এবং পাশাপাশি সংখ্যালঘুদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অধিকার নিশ্চিত করার জন্য সংবিধানে নির্দিষ্ট ধারা (২৯ ও ৩০ নং ধারা) যুক্ত করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গণপরিষদে বিতর্কের সময়ে 'সংখ্যালঘু' শব্দটির স্পষ্ট সংজ্ঞা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা হলেও, সংবিধানে এই শব্দটিকে সুনির্দিষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়নি। সংবিধানে দুই ধরনের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কথা বলা হয়েছে। যথা-(ক) ধর্মীয় সংখ্যালঘু এবং (খ) ভাষাগত সংখ্যালঘু।

রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিসমূহ প্রসঙ্গে গণপরিষদের বিতর্ক:

ভারতের সংবিধান প্রণয়নের সময়কালে রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিসমূহের উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি প্রসঙ্গে গণপরিষদের সদস্যদের মধ্যে বিতর্ক লক্ষ্য করা যায়। উল্লেখ্য, সংবিধানের চতুর্থ অংশে অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিসমূহ নিয়ে গণপরিষদে প্রায় ৬ দিন আলোচনা হয়েছিল। গণপরিষদের কিছু সদস্য যেমন আর. কে. সিদ্ধা (R. K. Sidhwa), কাজী সৈয়দ করিমউদ্দিন প্রমুখগণ নির্দেশমূলক নীতিসমূহের আদালত কর্তৃক অ-বলবৎযোগ্যতা (non-justiciable) নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তাঁরা নির্দেশমূলক নীতিসমূহগুলিকে আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য করার দাবী জানান। কাজী সৈয়দ করিমউদ্দিন বলেন, যদি এই নীতিগুলি আদালত কর্তৃক বলবতযোগ্য না হয়, অথবা এই নীতিগুলি যদি রাষ্ট্রের জন্য বাধ্যতামূলক না হয় তাহলে তা অর্থহীন হয়ে পড়বে। গণপরিষদের অন্যতম সদস্য কে. টি. শাহ (K. T. Shah) এই নির্দেশগুলিকে 'উপযুক্ত আমানতহীন ব্যাংকের চেক'-এর সঙ্গে তুলনা করেছিলেন।

আম্বেদকর সহ অন্যান্য অনেক সদস্য এই প্রস্তাবের বিরোধীতা করেন। আম্বেদকর গণপরিষদে বিতর্ক চলাকালীন নির্দেশমূলক নীতিসমূহের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এই নীতিগুলিকে নির্দেশ দানের হাতিয়ার ('instruments of instruction') বলে অভিহিত করেছিলেন। তাঁর মতে, রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশমুলক নীতিগুলি হল সরকার ও পার্লামেন্টের প্রতি সাধারণ নির্দেশ। ড. বি. আর. আম্বেদকর বলেছিলেন, "যদি একথা বলা হয় যে, নির্দেশমূলক নীতিসমূহের পিছনে কোনো আইনগত সমর্থন নেই, তাহলে আমি তা মেনে নিতে রাজি। কিন্তু তাদের পশ্চাতে কোনো কার্যকর শক্তি নেই- একথা আমি মেনে নিতে রাজি নই। সেগুলিকে ভঙ্গ করার জন্য ক্ষমতাসীন কোনো ব্যক্তিকে আদালতের কাছে কৈফিয়ত দিতে না হলেও তাকে অবশ্যই নির্বাচনের সময় নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে জবাবদিহি করতে হবে"। তিনি আরও বলেন, এই নীতিগুলি জনমতের উপর নির্ভরশীল, যা একটি গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় শক্তিশালী ভূমিকা পালন করে।

রাষ্ট্রপতি প্রসঙ্গে গণপরিষদের বিতর্ক:

ভারতের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ও তার ভূমিকাকে কেন্দ্র করে গণপরিষদের সদস্যদের মধ্যে ব্যাপক বিতর্ক হয়েছিল। ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ গণপরিষদে মন্তব্য করেন যে, 'রাষ্ট্রপতি' হলেন জাতীয় একতার প্রতীক (The President of India is a symbol of national unity)। ভারতের রাষ্ট্রপতি জনগণের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হবেন নাকি কোনো নির্বাচক সংস্থার (Electoral College) মাধ্যমে পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হবেন তা নিয়ে গণপরিষদে বিতর্ক দেখা দেয়। গণপরিষদের অন্যতম সদস্য কাজি সৈয়দ করিমউদ্দিন (Kazi Syed Karimuddin), তাজাম্মুল হোসেন (Tajamul Husain) প্রমুখগণ রাষ্ট্রপতির প্রত্যক্ষ নির্বাচনের পক্ষে জোরালো সওয়াল করেন। করিমউদ্দিন বলেন যে, ভারতের মত বৈচিত্রপূর্ণ দেশে, বহুদলীয় ব্যবস্থায় সংসদীয় ব্যবস্থা বহির্ভূত শাসক হিসাবে রাষ্ট্রপতির সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হওয়া উচিৎ।

অন্যদিকে, জওহরলাল নেহরু, কে. সি. রেড্ডি (K. C. Reddy), হনুমন্তাইয়া (K. Hanumanthaiya), আম্বেদকর প্রমুখগণ রাষ্ট্রপতির পরোক্ষ নির্বাচনের পক্ষে মতামত পোষণ করেন। নেহরু বলেন যে, ভারতে যেহেতু সংসদীয় বা মন্ত্রী পরিষদ পরিচালিত শাসনব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, এক্ষেত্রে প্রকৃত শাসন ক্ষমতার অধিকারী প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন মন্ত্রীপরিষদ। সেকারণে রাষ্ট্রপতির প্রত্যক্ষ নির্বাচন অযথা সময় ও অর্থের অপচয় ছাড়া আর কিছুই নয়। আম্বেদকর বলেন যে, ভারতের মত জনবহুল দেশে রাষ্ট্রপতির প্রত্যক্ষ নির্বাচন অসম্ভব। রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার ভারসাম্যের প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, সংসদীয় ব্যবস্থার রীতি অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি নামসর্বস্ব শাসক, প্রকৃত শাসক হলেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রীর মত রাষ্ট্রপতিও যদি প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হন তাহলে ক্ষমতাগত ভারসাম্য থাকবে না, যা কার্যত সংসদীয় ব্যবস্থার বিরোধী।

১৯৪৯ সালের ২৩ মে খসড়া সংবিধানের ১০২ (১) নং ধারায় (বর্তমান সংবিধানের ১২৩ (১) নং ধারা) উল্লিখিত রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ বা অর্ডিন্যান্স (Ordinance) জারির ক্ষমতা নিয়ে গণপরিষদে বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। খসড়া সংবিধানের ১০২ (১) নং ধারা অনুযায়ী পার্লামেন্টের অধিবেশন চলাকালীন সময় ছাড়া অন্য কোনো সময়ে, রাষ্ট্রপতির যদি মনে হয় যে, এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, যেক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন, তাহলে তিনি ঐ অবস্থার প্রতিকারে অধ্যাদেশ জারি করতে পারেন। গণপরিষদের একজন সদস্য ১০২ (১) নং ধারার সংশোধনী প্রস্তাব উথাপন করেন। তিনি বলেন, রাষ্ট্রপতি কেবলমাত্র তখনই অধ্যাদেশ জারি করতে পারবেন যখন পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের অধিবেশন বন্ধ থাকবে। আম্বেদকর এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে বলেন যে, এক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা প্রায় অকার্যকর হয়ে যাবে। তাই কোনো একটি কক্ষের অধিবেশন চলাকালীন সময়েও রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ জারি করার সুযোগ থাকা উচিত। শেষ পর্যন্ত সংশোধনী প্রস্তাবটি বাতিল হয়ে যায়। কিছু সদস্য প্রস্তাব করেন যে অধ্যাদেশ জারির চার সপ্তাহের মধ্যে তা পার্লামেন্টে উপস্থাপিত করতে হবে, অন্যথায় তা বাতিল হবে। এই প্রস্তাবও গণপরিষদে গৃহীত হয়নি।

রাষ্ট্রপতির জরুরী অবস্থা জারি সংক্রান্ত ক্ষমতা নিয়েও গণপরিষদে বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। জরুরী অবস্থা ঘোষণার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতিকে যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে সেক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীসভার অনুমোদন প্রয়োজন রয়েছে কিনা সে বিষয়ে গণপরিষদের সদস্যদের মধ্যে বিতর্ক লক্ষ্য করা যায়। কামাথ, ব্রজেশ্বর প্রসাদ (Brajeshwar Prasad), পি. এস. দেশমুখ (P. S. Deshmukh), নাজিরুদ্দিন আহমেদ (Naziruddin Ahmad), তাজাম্মুল হোসেন, মহাবীর ত্যাগী প্রমুখগণ প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীসভার সাথে পরামর্শের ভিত্তিতেই রাষ্ট্রপতির জরুরী অবস্থা ঘোষণার বিষয়ে মতামত জ্ঞাপন করেন। অন্যদিকে কাজি সৈয়দ করিমউদ্দিন, টি টি

কৃষ্ণমাচারিয়া (T. T. Krishnamachari), বিশ্বনাথ দাস প্রমুখগণ এই মতামতের বিরোধীতা করেন। সৈয়দ করিমউদ্দিন ৩৫২ নং ধারার বিরোধীতা করেন। রাষ্ট্রপতির জরুরী অবস্থা সংক্রান্ত বিষয়ে বিশ্বনাথ দাস আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে, কেন্দ্রের ক্ষমতাশালী দল নিজের সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থে অভ্যন্তরীণ গোলোযোগ কিংবা অন্যান্য অজুহাতে জরুরী ব্যবস্থার অপব্যবহার করতে পারে।

নির্বাচন কমিশন প্রসঙ্গে গণপরিষদের বিতর্ক:

সমগ্র দেশে একটি নির্বাচন কমিশন থাকবে নাকি কেন্দ্রের পাশাপাশি প্রতিটি রাজ্যের জন্য আলাদা আলাদা নির্বাচন কমিশন থাকবে তা নিয়ে গণপরিষদের সদস্যদের মধ্যে বিতর্ক লক্ষ্য করা যায়। গণপরিষদের অন্যতম সদস্য এইচ. ভি. পাটাস্কর (H. V. Pataskar), কুঞ্জুরু, শান্তানাম প্রমুখগণ আঞ্চলিক নির্বাচন কমিশনের পক্ষে সওয়াল করেন। পাটাস্কর বলেন যে, কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের গঠন কার্যত আঞ্চলিক বা প্রাদেশিক নির্বাচন কমিশনের স্বতন্ত্র্যতাকে ক্ষুণ্ণ করে। শান্তানাম কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনকে বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা প্রদানের কথা বললেও, প্রশাসনিক ক্ষমতা প্রদানের পক্ষপাতি ছিলেন না। তবে, আম্বেদকর, নাজিরুদ্দিন আহমেদ প্রমুখগণ কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের পক্ষেই সওয়াল করেন। আম্বেদকর সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন যে, যদি প্রাদেশিক বা রাজ্যের জন্য পৃথক নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয় তাহলে প্রাদেশিক সরকারগুলি নির্বাচনী তালিকা থেকে জাতিগতভাবে পিছিয়ে পড়া ব্যক্তিদেরকে বাদ দিতে পারে। শেষ পর্যন্ত সমগ্র দেশের জন্য একটি নির্বাচন কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

নির্বাচন কমিশনের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা নিয়েও গণপরিষদে তীব্র বিতর্ক হয়। অধ্যাপক শিব্বনলাল সক্সেনা (Shibban Lal Saksena) প্রস্তাব দেন যে, পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের দুই-তৃতীয়াংশের সংখ্যাগরিষ্ঠতার মাধ্যমে অনুমোদন ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগ করবেন। কুঞ্জরু বলেন, মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের অপসারণের ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের বিচারকের মতো সুরক্ষা দেওয়া হলেও, অন্য কমিশনারদের অপসারণ মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের সুপারিশের ওপর নির্ভরশীল, যা তাদের স্বাধীনতাকে খর্ব করে। তিনি মনে করেন, রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে দলীয় ব্যক্তিকে নিয়োগ করতে পারেন। তাই তিনি এই বিষয়ে পার্লামেন্টকে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদানের পরামর্শ দেন। এই বিতর্কের প্রেক্ষিতে আম্বেদকর একটি সংশোধিত প্রস্তাব দেন। তিনি বলেন পার্লামেন্ট কর্তৃক প্রণীত আইন অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি মুখ্য নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগ এবং তাদের চাকরির শর্তাদি ও কার্যকাল নির্ধারণ করবেন। সবশেষে সাক্সেনার প্রস্তাবটি বাতিল হয় এবং আম্বেদকরের প্রস্তাবটি গৃহীত হয়।

ভারতের সাংবিধানিক রাজনীতিতে গণপরিষদের বিতর্কের তাৎপর্য:

ভারতের সাংবিধানিক প্রেক্ষাপটে গণপরিষদের বিতর্কসমূহ এক অমূল্য দলিল হিসাবে বিবেচিত। ১৯৪৬ সাল থেকে ১৯৪৯ সালের মধ্যে গণপরিষদে অনুষ্ঠিত বিতর্কগুলি শুধুমাত্র ভারতের একটি সংবিধানের কাঠামো নির্ধারণ করেনি, বরং স্বাধীন ভারতের গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, সামজিক ন্যায়বিচার এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর নৈতিক ভিত্তিকে সুদৃঢ় করেছে। সেকারণে ভারতের সাংবিধানিক রাজনীতিতে গণপরিষদের বিতর্কগুলির বিশেষ ঐতিহাসিক, তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক গুরুত্ব রয়েছে।

(১) সংবিধানের কোনো ধারার অস্পষ্টতা দূরীকরণ বা তার সঠিক ব্যাখ্যা প্রদানের ক্ষেত্রে গণপরিষদের বিতর্কসমূহ একটি নির্ভরযোগ্য উৎস হিসেবে বিবেচিত। অনেক ক্ষেত্রে বিচারকগণ সংবিধানের প্রকৃত মর্ম অনুধাবনে এই বিতর্কের আলোচনাকে উল্লেখ করেন। তাই বলা যায়, গণপরিষদের বিতর্কসমূহ সংবিধান-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এক ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

(২) মৌলিক অধিকার, রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিসমূহ, যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো এবং সংখ্যালঘু অধিকারের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি নিয়ে গণপরিষদে যে গভীর আলোচনা ও বিতর্ক হয়েছিল, তা ভারতের গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শের ভিত্তিকে দৃঢ় করেছে।

(৩) গণপরিষদে বিভিন্ন ধর্ম, ভাষা, জাতি, শ্রেণি ও রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রতিনিধিত্ব ছিল এবং বিতর্কগুলিতে এই বহুত্বের কণ্ঠস্বর প্রতিফলিত হয়েছে। এই প্রবণতা ভারতের সংবিধানে বহুত্ববাদী ও অন্তর্ভুক্তিমূলক রাষ্ট্রচেতনার ভিত্তি স্থাপন করেছে।

(৪) গণপরিষদের বিতর্কগুলির মাধ্যমে এই ধারণা সুস্পষ্ট হয় যে, ভারতীয় সংবিধান কোনো একক ব্যক্তির চিন্তার ফল নয়; বরং এটি বিভিন্ন মত, যুক্তি, সমঝোতা ও বিতর্কের সম্মিলিত ফলাফল। এই বহুমাত্রিক প্রক্রিয়াই সংবিধানের বৈধতা ও গ্রহণযোগ্যতাকে আরও সুদৃঢ় করেছে।

(৫) গণপরিষদের বিতর্কগুলিতে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ, তপশিলি জাতি ও উপজাতি শ্রেণীর জন্য সংরক্ষণের মতো সামাজিক বিষয়গুলি নিয়েও অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করা হয়েছিল। এই আলোচনাগুলি সামাজিক বৈষম্য দূর করে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতিকে আরও দৃঢ় করে।

(৬) গণপরিষদের বিতর্ক শুধুমাত্র আইনগত দিক থেকে নয়, নৈতিক ও দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকেও গুরুত্বপূর্ণ। গণপরিষদের সদস্যরা ন্যায়, স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের মতো মূল্যবোধকে সংবিধানের ভিত্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। বলা বাহুল্য, এই মূল্যবোধগুলি ভারতের সাংবিধানিক রাজনীতির প্রাণশক্তি হিসেবে কার্যকর রয়েছে।

(৭) জাতীয় ঐক্যের ধারণাকে মজবুত করার ক্ষেত্রে গণপরিষদের বিতর্কসমূহের তাৎপর্য অপরিসীম। গণপরিষদের সদস্যদের মধ্যে মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও রাষ্ট্রের মৌলিক নীতির ক্ষেত্রে যেমন- গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সামাজিক ন্যায় প্রভৃতি বিষয়ে সর্বসম্মত মতৈক্য গড়ে ওঠে। এই মতৈক্য ভারতের জাতীয় ঐক্যকে মজবুত করে এবং সংবিধানের ভিত্তিকে আরও স্থিতিশীল করে তোলে।

(৮) ভারতের সংবিধান বোঝার ক্ষেত্রে গণপরিষদের বিতর্কের ঐতিহাসিক ও শিক্ষামূলক তাৎপর্য অপরিসীম। গণপরিষদের বিতর্কগুলির মাধ্যমে ভারতীয় রাজনীতি, সমাজ, দর্শন ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সম্পর্কে গভীর শিক্ষণীয় দিকগুলি উদ্ভাসিত হয়েছে।

উপসংহার:

ভারতের সংবিধান প্রণয়নের প্রক্রিয়ায় গণপরিষদের বিতর্কসমূহ এক অমূল্য ঐতিহাসিক দলিল হিসাবে বিবেচিত। এই বিতর্কগুলির মাধ্যমে শুধুমাত্র সংবিধানের ধারাসমূহই রচিত হয়নি, বরং ভারতবর্ষের রাজনৈতিক চেতনা, সামাজিক দর্শন এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের সুদৃঢ় ভিত্তি নির্মিত হয়েছে। গণপরিষদে বিভিন্ন ধর্ম, ভাষা, অঞ্চল ও শ্রেণির প্রতিনিধিরা অংশ নিয়েছিলেন। তবে, গণপরিষদের সদস্যদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে মতপার্থক্য থাকলেও সার্বিক প্রয়োজনীয়তার কারণে তাঁরা ব্যক্তিগত মতপার্থক্যের উর্ধ্বে উঠে সর্বজনীন যৌক্তিকতাকে উপস্থাপিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন; বলা বাহুল্য যা ভারতের সংবিধানের ভিত্তিকে আরও মজবুত করেছে। গণপরিষদের সম্মানীয় সদস্যরা এ কারণে যুক্তিনিষ্ঠ আলোচনা ও বিতর্কের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তাঁরা শুধুমাত্র তাদের নিছক স্বার্থগুলিকেই তুলে ধরেননি, একই সঙ্গে তাঁরা অন্যান্য সদস্যদের অবস্থানের যথাযথ বিচার ও গুরুত্ব দিতেও সক্ষম হয়েছিলেন। সংবিধানের বিভিন্ন ধারা নিয়ে গণপরিষদের ব্যাপক বিতর্ক প্রকৃত অর্থে ছিল জনগণের বিভিন্ন দাবি বা প্রয়োজনীয়তার প্রতি শ্রদ্ধা

প্রদর্শন। ভারতের এই সংবিধান রচনার ইতিহাসে গণপরিষদের বিতর্কের পর্বটিকে ততটাই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় বলে বিবেচনা করা যায় যতটা আমেরিকা বা ফরাসি বিপ্লবকে আমরা গুরুত্বপূর্ণ মনে করি। পরিশেষে বলা যায়, গণপরিষদের বিতর্ক শুধুমাত্র সংবিধান প্রণয়নের রেকর্ড নয়; এটি ভারতের রাজনৈতিক সংস্কৃতির বিকাশের এক ঐতিহাসিক দলিল, যা আজও রাষ্ট্রচিন্তা, সংবিধান ব্যাখ্যা এবং নীতি-নির্ধারণে প্রেরণার উৎস হিসাবে কাজ করে।

তথ্যসূত্র:

1. Lok Sabha Secretariat. (2014). Constituent Assembly Debates (Official Report) (Vols. 1–12). Lok Sabha Secretariat.
2. Austin, G. (1966). The Indian Constitution: Cornerstone of a nation. Clarendon Press.
3. Austin, G. (1999). Working a democratic constitution: A history of the Indian experience. Oxford University Press.
4. Basu, D. D. (2020). Introduction to the Constitution of India (25th ed.). LexisNexis.
5. Chakrabarty, B. (2017). Constitutional democracy in India. Routledge.
6. De, R., & Shani, O. (2025). Assembling India's constitution: A new democratic history. Cambridge University Press.
7. Khosla, M. (2020). India's founding moment: The constitution of a most surprising democracy. Harvard University Press.
8. Kashyap, S. C. (2008). Our Constitution: An introduction to India's Constitution and constitutional law. National Book Trust.
9. Rao, B. S. (Ed.). (1968). The framing of India's Constitution: Select documents (Vols. 1–5). Indian Institute of Public Administration.
10. De, R., & Shani, O. (2024). Assembling India’s Constitution: Towards a new history. Past & Present, 263(1), 205–248. https://doi.org/10.1093/pastj/gtad009
11. Shani, O. (2022). The people and the making of India’s Constitution. The Historical Journal, 65(4), 1102–1123. https://doi.org/10.1017/S0018246X21000856